

هَذَا تِلْكَ النَّاسِ هَكَذَا وَفِيهِ تِلْكَ النَّاسِ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদুদী
রহ.

লুকমান

৩১

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকু'তে লুকমান হাকীমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সুবাদে এ সূরার লুকমান নামকরণ করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাখিল হয় যখন ইসলামের দাওয়াতের কঠোরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং এ জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিল। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। ১৪ ও ১৫ আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নেবে না। একথাটাই সূরা আনকাবুতেও বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাখিল হয়। কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথমে নাখিল হয়। কারণ এর পঁচাত্তম্বে কোন তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা আনকাবুত পড়লে মনে হবে তার নাখিলের সময় মুসলমানদের ওপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় লোকদের বুঝানো হয়েছে, শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা। এই সংগে আহবান জানানো হয়েছে এই বলে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ রবুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা পেশ করছেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা করো এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখো, বিশ্ব-জগতের চারদিকে এবং নিজের মানবিক সম্ভার মধ্যেই কেমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে চলছে।

এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে, দুনিয়ায় বা আরবদেশে এই প্রথমবার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি আওয়াজ উঠানো হয়নি। আগেও লোকেরা বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং তারা একথাই বলতো। যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তোমাদের নিজেদের দেশেই ছিলেন মহাজ্ঞানী নুক্‌মান। তাঁর জ্ঞান-গরিমার কাহিনী তোমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথাবার্তায় তাঁর প্রবাদ বাক্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা উদ্ধৃত করে থাকো। তোমাদের কবি ও বাগ্মীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কথা বলেন। এখন তোমরা নিজেরাই দেখো তিনি কোন্ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও কোন্ ধরনের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ
 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ۝۱۷ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَبْنِي
 لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝۱۸

২ রুকু'

আমি^{১৭} লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।^{১৮} যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।^{১৯}

শ্রবণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।^{২০} যথাযথ শিরক অনেক বড় জুলুম।"^{২১}

যে কিছু করতে পারে সে-ই তো কিছু ভেঙ্গে যাওয়া জিনিস গড়তে পারে কিন্তু যার আদতে করারই কোন ক্ষমতা নেই সে আবার কেমন করে ভেঙে যাওয়া জিনিস গড়তে পারবে।

১৭. একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর এখন আরবের লোকদেরকে একথা জানানো হচ্ছে যে, এ যুক্তিসংগত কথা প্রথমবার তোমাদের সামনে তোলা হচ্ছে না বরং পূর্বেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা একথাই বলে এসেছেন এবং তোমাদের নিজেদের বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান আজ থেকে বহুকাল আগে একথাই বলে গেছেন। তাই শিরক যদি কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে কেউ একথা বলেনি কেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের জবাবে তোমরা একথা বলতে পারো না।

একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে আরবে লুকমান বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জাহেলী যুগের কবিরা যেমন ইমরাউল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ তাদের কবিতায় তার কথা বলা হয়েছে। আরবের কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে "সহীফা লুকমান" নামে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেতো। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মদীনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবনে সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মকায় যান। সেখানে নবী করীম (সা) নিজের নিয়ম মতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের আবাসস্থলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সুওয়াইদ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা শুনে, তাকে বলেন, আপনি যে ধরনের কথা বলছেন তেমনি ধরনের একটি

জিনিস আমার কাছেও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? জবাব দেন সেটা লুকমানের পুস্তিকা। তারপর নবী করীমের (সা) অনুরোধে তিনি তার কিছু অংশ পাঠ করে তাকে শুনান। তিনি বলেন, এটা বড়ই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে এর চেয়েও বেশী চমৎকার কথা আছে। এরপর কুরআন শুনান। কুরআন শুনে সুওয়াইদ অবশ্যই স্বীকার করেন, নিসন্দেহে এটা লুকমানের পুস্তিকার চেয়ে ভালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৬৭-৬৯ পৃঃ; উসুদুল গাবাহ, ২ খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সুওয়াইদ ইবনে সামেত তাঁর যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহিত্য ও কাব্য মনীষা এবং বংশ মর্যাদার কারণে মদীনায় “কামেল” নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর যখন তিনি মদীনায় ফিরে যান তার কিছুদিন পর বুয়াসের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে তিনি মারা যান। তাঁর গোত্রের লোকদের সাধারণভাবে এ ধারণা ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লুকমানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে কোন লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না। শত শত বছর থেকে মুখে মুখে শ্রুত যেসব তথ্য শ্রুতির ভাঙারে লোককাহিনী-গল্প-গাথার আকারে সংগৃহীত হয়ে আসছিল সেগুলোর ওপর ছিল এর ভিত্তি। এসব বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ হযরত লুকমানকে আদ জাতির অন্তরভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাঁর ‘আরদুল কুরআন’ গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হযরত হুদের (আ) সাথে তাদের যে ইমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ সাহাবী ও তাবেরীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনামূলক এরা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত আবু হুরাইরা (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদুর রাব'ঈও একথাই বলেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন নুব্বার অধিবাসী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ তিনটি বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সূদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই তিনটি উক্তিতে একই ব্যক্তিকে নুবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাদিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। তারপর রওদাতুল আনাফে সুহাইলির ও মুন্নজ্জয যাহাবে মাস'উদীর বর্ণনা থেকে এ সূদানী গোলামের কথা আরবে কেমন করে ছড়িয়ে পড়লো এ প্রশ্নের ওপরও আলোকপাত হয়। এ উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি আসলে ছিলেন নুবী। কিন্তু তিনি বাসিন্দা ছিলেন মাদুয়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। এ কারণে তাঁর ভাষা ছিল আরবী এবং তাঁর জ্ঞানের-কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া সুহাইলী আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়। (রওদুল আনাফ, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা এবং মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

এখানে একথাটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচ্যবিদ ডিরেনবুর্গ (Derenbourg) প্যারিস লাইব্রেরীর যে আরবী পাণ্ডুলিপিটি “লুকমান হাকীমের গাথা” (Fables De Loqman Lo Sage) নামে প্রকাশ করেছেন সেটি আসলে বানোয়াট। “লুকমানের সহীফা”র সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। ত্রয়োদশ ইসমায়ী শতকে এ গাথাগুলো কেউ সংকলন করেছিলেন। তাঁর আরবী সংস্করণ বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলো পড়লে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, আসলে অন্যকোন ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর সম্পর্ক লুকমান হাকীমের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদরা এ ধরনের জাল ও বানোয়াট জিনিসগুলো বের করে যে উদ্দেশ্যে সামনে আনেন তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কুরআন বর্ণিত কাহিনীগুলোকে যে কোনভাবেই অঐতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ করে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা। যে ব্যক্তিই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে “লুকমান” শিরোনামে (B. Heller) হেলারের নিবন্ধটি পড়বেন তাঁর কাছেই তাদের মনোভাব অস্পষ্ট থাকবে না।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টির প্রাথমিক চাহিদা এই ছিল যে, মানুষ তার রবের মোকাবিলায় কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবার নীতি অবলম্বন করবে, অনুগ্রহ অস্বীকার করার ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করবে না। আর তার কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক হিসেব-নিকেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং চিন্তা, কথা ও কাজ তিন পর্যায়েই পরিব্যাপ্ত হবে। আমি যা কিছু লাভ করেছি সবই আল্লাহর দান, নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের গভীরে তার এ বিশ্বাস ও চেতনাও সঞ্চারিত হবে। তার কণ্ঠে সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতিও উচ্চারিত হবে। কার্যক্ষেত্রেও সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাঁর হুকুম অমান্য করা থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে থেকে, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে সজ্ঞাম করে একথা প্রমাণ করে দেবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত।

১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর সৃষ্টি ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে।

২০. লুকমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমালা থেকে এ বিশেষ উপদেশ বাণীটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে দু’টি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। এক, তিনি নিজ পুত্রকে এ উপদেশটি দেন। আর একথা সুস্পষ্ট, মানুষ যদি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী কারো ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারে তাহলে সে হচ্ছে তার নিজের সন্তান। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাক্কি আচরণ করতে পারে কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকটিও নিজ পুত্রকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কখনই করতে পারে না। তাই লুকমানের তার নিজ পুত্রকে এ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي
عَامَيْنِ إِنَّ اشْكُرَّ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ②

—আর^{২২} প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে।^{২৩} (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

নসিহত করা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর মতে শিরক যথার্থই একটি নিকৃষ্ট কাজ এবং এ জন্যই তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে এ গোমরাহীটি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। দুই, মক্কার কাফেরদের অনেক পিতা-মাতা সে সময় নিজের সন্তানদেরকে শিরকী ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য বাধ্য করছিল। সামনের দিকের একথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সেই অজ্ঞদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমাদের দেশেরই বহুল পরিচিত জ্ঞানী পণ্ডিত তো তাঁর নিজের পুত্রের মংগল করার দায়িত্বটা তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার নসিহত করার মাধ্যমেই পালন করেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদেরকে শিরক করতে বাধ্য করছো, এটা কি তাদের প্রতি শুভেচ্ছা না তাদের অমংগল কামনা?

২১. জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শিরক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের সৃষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধনা হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায্য, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায্যের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার সৃষ্টারই বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করবে, এটা মানুষের ওপর তার সৃষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর সৃষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা-শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে সৃষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লালিত ও অপমানিতও করে এবং এই সংগে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক জুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও জুলুমমুক্ত নয়।

وَإِنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَعُودَ
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, ২৪ তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। ২৫ সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো। ২৬

২২. এখান থেকে প্যারার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ আয়াত দু'টি প্রসংগক্রমে বলা হয়েছে। আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে লুকমানের উক্তির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে একথা বলেছেন।

২৩. এ শব্দগুলো থেকে ইমাম শাফে'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর দুধ পান করার মেয়াদ ২ বছরে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মেয়াদকালে কোন শিশু যদি কোন জীলোকের দুধপান করে তাহলে দুধ পান করার "হরমাত" (অর্থাৎ দুধপান করার কারণে জীলোকটি তার মায়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য তার সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়া) প্রমাণিত হয়ে যাবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন প্রকার দুধ পান করার ফলে কোন "ছুরমাত" প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ উক্তির স্বপক্ষে ইমাম মালেকেরও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে এ মেয়াদকে বাড়িয়ে আড়াই বছর করার অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সংগে ইমাম সাহেব একথাও বলেন, যদি দু'বছর বা এর চেয়ে কম সময়ে শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে শিশু কেবল দুধের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, তাহলে এরপর কোন জীলোকের দুধ পান করার ফলে কোন দুধপান জনিত হরমাত প্রমাণিত হবে না। তবে যদি শিশুর আসল খাদ্য দুধই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য খাদ্য কম বেশী কিছু খেয়ে নিলেও এ সময়ের মধ্যে দুধ পানের কারণে হরমাত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ শিশুকে অপরিহার্যভাবে দু'বছরেই দুধপান করাতে হবে, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"মায়েরা শিশুদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাতে, তার জন্য যে দুধপান করার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।" (২৩৩ আয়াত)

يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ
 اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاَيُّهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ
 خَبِيْرٌ ۝۱۹ يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ
 عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِّنْ عَزِّ الْاُمُوْرِ ۝۲۰

(আর নুহমান^{২৭} বলেছিল) "হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা নুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন।^{২৮} তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো।^{২৯} একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।^{৩০}

ইবনে আব্বাস (রা) এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস। কারণ কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "وَحَمْلُهُ وَفَسَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا" "তার পেটের মধ্যে অবস্থান করা ও দুধ ছেড়ে দেয়ার কাজ হয় ৩০ মাসে।" (আল আহকাফ, আয়াত ১৫) এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে।

২৪. অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়।

২৫. অর্থাৎ সন্তান ও পিতা-মাতা সবাইকে।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাক্বীমুল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ১১ ও ১২ টীকা।

২৭. নুহমানের অন্যান্য উপদেশমালার উল্লেখ এখানে একথা বলার জন্য করা হচ্ছে যে, আকীদা-বিশ্বাসের মতো নৈতিকতার যে শিক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন তাও আরবে নতুন ও অজানা কথা নয়।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও-এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস তোমার কাছে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু তাঁর কাছে তা রয়েছে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। কাজেই ভূমি কোথাও কোন অবস্থায়ও এমন কোন সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারো না যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায়। তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغِضْ
مِنْ مَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, ৩১ পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আগ্রাহ পছন্দ করেন না আত্মভরী ও অহংকারীকে। ৩২ নিজের চলনে ভারসাম্য আনো ৩৩ এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ। ৩৪

সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন।

২৯. এর মধ্যে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তিই পালন করবে তাকে অনিবার্যভাবে বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হবে। এ ধরনের লোকের পেছনে দুনিয়া কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্টের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে।

৩০. এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটি বড়ই হিম্মতের কাজ। মানবতার সংশোধন এবং তার সংকট উত্তরণে সাহায্য করার কাজ কম হিম্মতের অধিকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব কাজ করার জন্য শক্ত বুকের পাটা দরকার।

৩১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ “সা’আর” বলা হয় আরবী ভাষায় একটি রোগকে। এ রোগটি হয় উটের ঘাড়। এ রোগের কারণে উট তার ঘাড় সবসময় একদিকে ফিরিয়ে রাখে। এ থেকেই فَلَنْ صَعْرُودَهُ “অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।” অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বললো। এ ব্যাপারেই তাগুলাব গোত্রের কবি আমর ইবনে হাই বলেন :

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعْرُودَهُ

اَقْمَنَا لَهُ مِنْ مِيلِهِ فَتَقَوْمَا

“আমরা এমন ছিলাম যখন কোন দাঙ্কি স্বৈরাচারী আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললো তখন আমরা তার বক্রতার এমন দফারফা করলাম যে একেবারে সোজা হয়ে গেলো”

৩২. মূল শব্দগুলো হচ্ছে مُخْتَالٍ وَفَخُورٌ — ‘মুখতাল’ মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর ফাখুর তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ব ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই

অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতে চায়।

৩৩. কোন কোন মুফাসসির এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, “দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চালে চলো।” কিন্তু পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ধীরে বা দ্রুত চলা আলোচ্য বিষয় নয়। ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কোন কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি? মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদণ্ড থেকেই থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে? আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ব অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, একথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দণ্ডলত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ব তার চাল-চলনে একটি বিশেষ ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দুষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুস্থ অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আগ্রাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবিলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। লুকমানের উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল-যুক্তিসংগত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ব এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রুচি যে পর্যায়ের গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, “মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।” আর একজনকে তিনি দেখলেন সে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন, “ওহে জালাম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন?” এ দু’টি ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত উমরের কাছে দীনদারির অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিষেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনি ঘটনা হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো, ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন) একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, “উমর ছিলেন

الْمُتَرَوِّا۟نَ اِنَّ اللّٰهَ سَخِرَ لَكُمْ مَآفِی السَّمٰوٰتِ وَمَآفِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَهٗ ظَٰهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًی ۚ وَلَا یُكْتَبُ مِنْۢهُ ۝ۛ

৩ রুকু'

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন^{৩৫} এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ^{৩৬} সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন? এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে,^{৩৭} তাদের নেই কোন প্রকার জ্ঞান, পথনির্দেশনা বা আলোক প্রদর্শনকারী কিতাব।^{৩৮}

কারীদের নেতা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৪৩ টীকা এবং সূরা আল ফুরকান, ৭৯ টীকা।)

৩৪. এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরীক্ষার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভংগী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দূরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অব্যাহত জোরে বলতে হবে। উচ্চারণভংগীর ফারাকের ব্যাপারটাও এমনি স্থান-কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণভংগী নিন্দা বাক্যের উচ্চারণভংগী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়। হযরত লুক্‌মানের নসীহতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভংগীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সম্ভ্রান্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা।

৩৫. কোন জিনিসকে কারো জন্য অনুগত করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে : এক, জিনিসটিকে তার অধীন ও ব্যবহারোপযোগী করে দেয়া হবে। তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় ও ব্যবহার করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হবে। দুই, জিনিসটিকে কোন নিয়মের অধীন করে দেয়া হবে। ফলে সর্বশ্রুটি ব্যক্তির জন্য তা উপকারী ও লাভজনক হয়ে যাবে এবং এতে তার স্বার্থ